OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 279 - 286
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান : বাংলা উপন্যাসে বৌদ্ধদর্শনের রূপায়ণ

কনক মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kanakmondal0@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Atish Dipankar Srigyan, Buddhism, Novel, Abul kasem, Sanmatrananda, Comparative discussion, New direction, Buddhism Philosophy.

Abstract

According to Buddhism, the term 'Dharma' is used in ten different senses, one of which is 'Path'. When analyzed, the word Dharma signifies upholding the purity of the mind. For centuries, the people of Tibet have revered and recognized the Bengali Buddhist scholar Atish Dipankar Srigyan as 'Dewo Chenpo' or the Great Lord. His extensive body of work and contributions can be traced in the Buddhist scriptural collections 'Tanjur' and 'Kanjur'.

Even a thousand years later, Atish Dipankar remains a luminous figure for Bengalis. Several novels have been written about him, capturing his philosophy and contributions to Buddhism. Abul Kasem's 'Atish' and Sanmatrananda's 'Nastik Panditer Bhita' (The Atheist Scholar's Abode) are two such novels that document his thoughts and perspectives on Buddhism. Atish was a proponent of the Mahāyāna tradition. Abul Kasem's 'Atish' vividly portrays the historical context, the ideological conflict between Mahāyāna and Hīnayāna, and the life of Atish Dipankar.

On the other hand, Sanmatrananda's 'Nastik Panditer Bhita' is structured across three different time periods— the present day, the 13th century focusing on Chag Lo-tsā-ba, and the 11th century of Atish Dipankar. The novelist skillfully interweaves these three epochs, balancing them while giving prominence to philosophical discourse over historical details. Time itself takes center stage in his novel. In contrast, Abul Kasem follows a different path, presenting Atish's biography in a modern narrative style.

Reading these two novels side by side offers a deeper understanding of Atish Dipankara's Buddhist philosophy. It also sheds light on why, even after all these years, his ideas and teachings continue to be relevant and worthy of scholarly attention.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

'ধর্ম' শব্দ 'ধৃ' ধাতু থেকে নির্মিত, ধারণ অর্থযুক্ত।[১] কী ধারণ করবে? নিজের স্বভাবকে। এই 'ধর্ম' শব্দটা শুধু বৌদ্ধ ধর্মকে বোঝায় না, বরং জগতে বিদ্যমান সমস্ত ধর্মকে বোঝায়। এছাড়াও কখনও কখনও দায়িত্ব, পরম্পরা আদিকেও ধর্ম হিসাবে অভিহিত করা হয়। তবে বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী এই 'ধর্ম' শব্দটি দশটি অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল 'পথ'। এখানে 'ধর্ম' শব্দ পথ-অর্থে বোঝায়, কেননা পথরূপী ধর্ম দ্বারা চিত্তের নির্মল অবস্থাকে কলুষিত হতে না দিয়ে তাতে স্থিত হতে হয়। সেই স্বভাবকে ধারণ করাই হল বাস্তবিক ধর্ম বা সদ্ধর্ম। যে বাণী অর্থ (হিত) এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, ক্লেশের নিবারণ করে আর শান্তি নিয়ে আসে, সেটাও বুদ্ধবচন। বিশ্লেষণ করলে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হয় 'চিত্তের শুদ্ধতাকে ধারণ করা।'[২]

তিব্বতি ভাষায় জেবো, জেবোজে অর্থে প্রভু, জেবো ছেনপো অর্থে মহাপ্রভু।[৩] গত একাদশ শতক থেকে বিশ শতক— এই হাজার বছর ধরে তিব্বতের মানুষ জেবোজে, জেবো ছেনপো বলতে প্রধানত যাঁকে জেনেছেন ও মেনেছেন, তিনি আমাদের বাঙালি বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি মাটির ঢিবিকে 'অতীশের ভিটা' বা 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এই বিক্রমপুরই অতীশ দীপংকরের জন্মস্থান বলে গবেষকরা দাবি করেন। অতীশ দীপংকরের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায় তিনি সুবর্ণদ্বীপে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এক যুগেরও বেশি। সুবর্ণদ্বীপ থেকে ভারতে এসে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ডাক আসে সুদূর তিব্বত থেকে। তিব্বতের রাজা লাহ্ লামা এশেওদ-এর আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করে ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে তিনি যেতে রাজি হন তিব্বতে।[৪] তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাস, রাজকাহিনি, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রগাঁথা ও সর্বোপরি তাঞ্জুর[৫] ও কঞ্জুর[৬] নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ-সংকলন— সে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মহৎ ও বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ তা তিব্বতি সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ভারত ও তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। সেই যুগে কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষ থেকে যে-সব বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিল, দীপংকর তাঁদের মধ্যে প্রথম নন। কিন্তু তিব্বতের ধর্মীয় ইতিহাসের খ্যাতি ও সম্মানে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর মানবমুখী ধর্মের উদাত্ত আহ্বানে অতীশ দীপংকর তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মজীবনেও সাধারণভাবে তিব্বতের সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। অতীশ দীপংকর বৌদ্ধদর্শন নিয়ে লিখেছেন বেশকিছু গ্রন্থ— 'বোধি-পথ-প্রদীপ', 'সত্যদ্বয়-অবতার', 'মধ্যমকোপদেশ', 'গর্ভ-সংগ্রহ', 'বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলি', 'শরণ-গচ্ছামি-দেশ', 'বোধিসত্ত্বাদিকর্মিক-মর্গাবতার-দেশনা', 'চর্যা-সংগ্রহ-প্রদীপ', 'মহাযান-পথ-সাধন-বর্ণ-সংগ্রহ' ইত্যাদি।

হাজার বছর পরেও অতীশ দীপংকর বাঙালির উজ্জ্বল চরিত্র। লিখিত হয়েছে আবুল কাসেম-এর *অতীশ*, সন্মাত্রানন্দ-এর *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা*-র মতো উপন্যাস। বৌদ্ধদর্শন নিয়ে অতীশের যে ভাবনা তা এই উপন্যাসগুলিতে রূপায়িত হয়েছে।

বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করলে আমরা হীনযান, মহাযান, সহজযানের প্রসঙ্গ পাই। কিন্তু কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলা হয়, আর মহাযানকে কেন 'মহা' বলা হয় এ প্রশ্ন মনে উদিত হয়। তার আগে আমাদের জানতে হবে 'যান' শব্দের ব্যাখ্যা।

> "'যান' শব্দের অর্থ হল বাহন, রথ এবং পালকি। কারণ এঁরা ভার বহন করে। কালচক্রের টীকা বিমলপ্রভা অনুযায়ী 'এর মাধ্যমে কোথাও যাওয়া যায়, অতঃ এটি হল যান। সংক্ষেপে, 'যান' শব্দের অর্থ যার মাধ্যমে কোনও এক স্থানে যাওয়া যায় বা পৌঁছনো যায় অর্থাৎ এর মাধ্যমে সাধক ধর্ম পালনের পরিণামস্বরূপ ফল অবস্থাতে পৌঁছায়। অতএব এটি হল যান। কোনও উৎস-তে এর অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা আছে 'যার মাধ্যমে উত্তরোত্তর যাওয়া যায় অথবা সেখানে পৌঁছানোর বাহন সাদৃশ্য; অর্থাৎ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> দুর্গতি বা সাংসারিক দুঃখকে অতিক্রম করে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেস্‌রূপী নির্বাণ অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া মার্গসত্যে অন্তর্ভুক্ত ধর্মই হল যান।”[৭]

এই ‘যান’ নামক শব্দকে যুক্ত করে অন্য শব্দেরও গঠন করা হয়, যেমন— গোযান, অজযান, ধর্মযান, ব্রহ্মযান, দেবযান, পিতৃযান ইত্যাদি। উৎস অনুযায়ী, ‘যান’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবে হয়েছে, ‘যায়তে অনেনেতি যানং’ অর্থাৎ যার দ্বারা যাওয়া যায়, সেটি হল যান।[৮] এই বিগ্রহ অনুযায়ী মার্গ, যার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাওয়া যায়, সেটি হল যান। এই হল যান শব্দের বাচক। পূর্বে হীনযান বলে কোনও যান ছিল না। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলত। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। নিজে উদ্ধার অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হলেই হল, এঁরা জগতের কথা ভাবে না। এই কারণেই মহাযানরা এঁদের আখ্যায়িত করলেন ‘হীন’ বলেছেন। যাঁরা আখ্যায়িত করলেন তাঁরা হলেন মহাযান।

আবুল কাশেমের *অতীশ* উপন্যাসে লেখক বলছেন—

> “অতীশ যখন এ বিহারে ছাত্র ছিলেন, সকল বিষয়ে তাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তবে সব বিষয় তাঁকে আজ আর টানে না। তিনি এখন বুদ্ধের শিক্ষার যেসব মূলনীতি আছে, বিশেষ করে মহাযানী বৌদ্ধ মতবাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। নীতিগত দিকের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি। আদর্শের প্রশ্নে অটল থাকছেন।”[৯]

অর্থাৎ অতীশ দীপংকর মহাযান দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। *অতীশ* উপন্যাসের মধ্যে একজন আচার্য অতীশ দীপংকরকে জিজ্ঞাসা করেন— শ্রীজ্ঞান আপনার কাছে জানতে চাইছি মহাযান এবং হীনযান এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তন্ত্রমন্ত্র সাধনা, পৌরাণিক কাহিনির প্রভাবও বৌদ্ধ ধর্মে বিস্তার লাভ করছে। তাতে বৌদ্ধধর্মের জন্য কোনো সংকট সৃষ্টি হচ্ছে কি?

অতীশ এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—

> “বৌদ্ধ ধর্ম একটি আধুনিক ধর্ম।
>
> বৌদ্ধ ধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক বোধের গভীরতা। এ ধর্মের প্রচারের শুরু থেকে এত উঁচুদরের দার্শনিক চিন্তাবিদ, পণ্ডিত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন যে, অন্য কোনো ভারতীয় ধর্মের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন নালন্দা, বিক্রমশীল মহাবিহার যেমন শ্রীভবদেব মহাবিহার, ওদন্তীপুর বিহার, আমরা যেখানে বসে কথা বলছি সোমপুর মহাবিহার প্রভৃতি স্থানে অন্যান্য বিষয় যেমন বেদ, অধিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধ্যান-সাধন ইত্যাদির সঙ্গে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও নানা মতবাদ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। এত পণ্ডিত-মহাপণ্ডিত এতে যুক্ত হয়েছেন যে তাতে হতাশ না হয়ে বরং গৌরব করার বহু কিছু আছে।
>
> ...ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে একবার দেখুন বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানতাত্ত্বিক সবাই বৌদ্ধধর্ম দর্শনকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান তাঁদেরই উদ্ভাবন। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। আধুনিক চিন্তা সব সময়ই অগ্রসরমান; পশ্চাদগামী নয়।”[১০]

বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযানীদের মত অনুসারে নির্বাণের তিনটি অবস্থা— শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতার পরম জ্ঞান নির্বাণ। শূন্যতত্ত্বের স্রষ্টা নাগার্জুন বলেন, দুঃখ কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য। বজ্রযানীরা নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করলেন নৈরাত্মা। বললেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করলে এই নৈরাত্মাতেই বিলীন হয়। নৈরাত্মা দেবীরূপে কল্পিত। বজ্রযানীদের মতে মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরমানন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান, তাই বোধিচিত্ত। মিথুনাবস্থার অনন্দোদ্ভূত বিভিন্ন দেব-দেবী সাধকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে এসে অধিষ্ঠিত হয়ে এক একটি ধ্যানমণ্ডল তৈরি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান করতে করতেই বোধিচিত্ত স্থায়ী এবং স্থির বজ্রের মতো কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধি লাভ ঘটে। নির্বাণ লাভের পথ অতি কঠিন, তাই এক দল বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ সহজযানের কথা বললেন। যার মাধ্যমে গুরুর দেখানো পথে নির্বাণ লাভ করা যাবে সহজে। *অতীশ* উপন্যাসে আবুল কাসেম চমৎকার ভাবে ভুসুকু চরিত্রকে এনেছেন। এই চরিত্রটির জন্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৌদ্ধদর্শন বুঝতে আরও সহজ হবে পাঠকের। ভুসুকুর বজ্রযান থেকে সহজযানে উত্তরণ ঘটলে লেখন সহজযানের মত ব্যাখ্যা দেন —

> "সহজযানীরা বলেন, 'দেহস্থিতংবুদ্ধত্ব; দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই। এরাও মনে করেন, শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা হল পুরুষ, শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ নারী-পুরুষের মিথুন মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দ, তাই মহাসুখ। এ মহাসুখই ধ্রুবসত্য।"[১১]

আবুল কাসেম অতীশ দীপংকরের জীবনী হুবহু বর্ণনা করে যাননি উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর জীবনের ইতিহাস যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই বর্ণনা করেছেন বৌদ্ধ দর্শন। তিব্বত গমনের পর পোন ধর্ম ও বন ধর্মের অধিকর্তাদের সঙ্গে অতীশের কথোপকথন গল্পের ছলে দারুণ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। রিংছেন সাংপোর মুখ থেকে জানা যায়—

> "প্রাচীন পোন ধর্মের ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, তান্ত্রিক তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক বিষয়গুলোকে মিলিয়ে ফেলাতে ধর্মবিশ্বাসের স্থানীয় বলে তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রাজশক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছে।"[১২]

ফলে তিব্বতের রাজা ভীত হয়ে পড়েন। এই প্রাচীন পোন ধর্মের মানুষের বিশ্বাস পরবর্তীকালে রাজ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। আবার বন-রাও বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারা স্থানীয় তন্ত্রমন্ত্রে বেশি প্রভাবিত। ধর্মের শৃঙ্খলার জন্য অতীশ দীপঙ্করকে বহু চেষ্টার পর তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হয়। উপন্যাসে পোন মতাবলম্বী মানুষদের বৌদ্ধধর্মের সঠিক দর্শনে ফেরাতে অতীশ একটি সুন্দর কৌশল উপস্থাপন করেন। মানুষের বিশ্বাসকে সম্মান না দিলে তাকে নিজের মত বোঝানো কঠিন এ কথা অতীশ দীপংকর জানতেন। তাই অতীশ পোনদের বিশ্বাসের দেব-দেবীদের বসিয়েছিলেন থোলিং বিহারের বিভিন্ন স্থানে। তিনি বললেন—

> "মানুষ শ্রদ্ধা করে যাকে দেবতা বানিয়েছে তার সম্মান সকল ধর্মের মানুষের কাছে থাকা উচিত। আপনারা যদি আমাদের ধর্ম এবং দেবতাকে সম্মান করেন, আমিও আপনাদের দেবতাকে সম্মান করব। পরমত এবং পরধর্মসহিষ্ণুতা আজকের পৃথিবীতে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। হিংসা, বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা-অসম্মান আমরা চাই না। তবে মানুষের অমঙ্গল এবং মানবতার অসম্মান হতে পারে, ধর্মীয় রীতি-নীতির নামে আমরা এরকম আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকব। আমরা নিজেরাও জানি অমঙ্গল কিসে, ক্ষতি কিসে, বিপর্যয় কিসে। ধর্ম ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তবে কিছু কিছু ধর্মীয় মূল্যবোধ অকল্যাণ ছড়াচ্ছে। মানব হত্যা কিংবা মানবের সম্ভ্রম ও অধিকার হরণের কোনো অধিকারই কোনো ধর্মীয় অনুশাসনে দেয়া হয়নি। আমার বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম দেয়নি, পোন ধর্মও দেয়নি। বরং নিষেধ করেছে।"[১৩]

পোন ধর্মসম্প্রদায়ের একজন নেতা বললেন, আমরা আমাদের আদিম রীতিনীতি, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পরিত্যাগ করব কী করে?

অতীশ দীপংকর তখন বলছেন,

> "যা অশুভ তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। নর হত্যা, নারী নির্যাতন, জুলুম ইত্যাদি কোনো অবস্থায় মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন ধর্মাচার কৃষ্টি সংস্কৃতি সংস্কার এসব ছাড়তে বলছে কে আপনাকে? ধর্মবিশ্বাস সামাজিক অপরাধ নয়, এ বিশ্বাসকে জোর করে প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান।"[১৪]

আরেকজন পোন ধর্মীয় নেতা বললেন, মহাচার্য, আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে চাই তাহলে তো আমাদের বাবা-দাদার ধর্ম, দেব-দেবী, এত দিনের বিশ্বাস সংস্কৃতি সব ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। আমি তা চাই না।

এই প্রশ্নের উত্তরে অতীশ বললেন—

> "ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের লোকজন নানা দেব-দেবীর পূজা করে। এরা নানা সংস্কারে আবদ্ধ, সে সব সংস্কার, বিশ্বাস এবং দেব-দেবীদের নিয়েই এরা নতুন নতুন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ধর্মে দীক্ষা লাভ করছে। ... আমরা কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভেবে পরস্পর শ্রদ্ধাশীল হব। এ বার্তাটা বনদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে অহিংসা পরম ধর্ম।"[১৫]

এই ধর্মে ধর্মে মিলনের কথা এর আগে কেউ বলেনি। *অতীশ* উপন্যাসে আবুল কাসেম যেমন বৌদ্ধ দর্শনের রূপায়ন করেছেন, একটু লক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারব অতীশ দীপংকর যে বৌদ্ধ দর্শনচর্চার নতুন অভিমুখ দেখালেন তাও এখানে স্পষ্ট।

উপন্যাসের মধ্যে ভূমিগর্ভের সঙ্গে অতীশের কথোপকথনে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ভুলের কথাও তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। দশম শতকের ভারতবর্ষের বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষ করে মহাযান পন্থার যে বিবর্তন, তার সঙ্গে হোশাংদের ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনের দারুণ মিল রয়েছে। চীনা হোশাংরা হিউয়েন সাঙ কিংবা সেঙচিদের মত ভারতে আসা ধর্মীয় পর্যটকদের কাছ থেকে মহাযানী বৌদ্ধ দর্শনের দীক্ষা লাভ করেছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বিবর্তনটা প্রায় একই বিষয়কে অবলম্বন করে।

অতীশ এই বিষয়ে বললেন—

> "মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে শতবর্ষ আগে নতুনতর তান্ত্রিক ধ্যান কল্পনার স্পর্শ লেগেছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে গুহ্যসাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি এবং পূজা আচার অনুপ্রবেশ করেছে। ...ভারতীয় বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আছে পর্বতকান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম সমাজের লোকেদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যোগিনী-ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযান দেবায়তনে স্থান দেয়া হয়। নানা গুহ্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ধারণা প্রভৃতিও তাদের সঙ্গে আসে।"[১৬]

পণ্ডিত ভূমিগর্ত বললেন, এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে। লৌকিক দেব-দেবী এবং তন্ত্রমন্ত্র হোশাংদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে একইভাবে প্রবেশ করেছে, পোন এবং বনদের লৌকিক ধর্মবিশ্বাস থেকে। কালে পরিবর্তিত রূপে তাই প্রধান হয়ে উঠেছে— গৌণ হয়ে গেছে বৌদ্ধ ধর্ম।

অতীশের ব্যক্তব্য—

> "ভুলটা করেছেন আমাদের মতো পণ্ডিতেরা। ...সাধারণ বৌদ্ধদের পক্ষে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, নানা উচ্চমার্গীয় যোগাচার অনুসরণ সম্ভব ছিল না, বুঝতও না। তাদের কাছে যাদুশক্তি, মন্ত্র প্রভৃতি সহজ ছিল। আর তাই অবলম্বন করে নিল নিজস্ব লৌকিক ঐতিহ্যে।"[১৭]

অতীশ দীপংকর কেবল অন্য প্রাচীন ধর্মের সংস্কারে করেছেন তিব্বতে গিয়ে তেমনটি মোটেই ঔপন্যাসিক দেখাননি। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের দুর্বল দিকগুলিও নির্দেশ করে গেছেন। পুরাতন বৌদ্ধ দর্শনকে সামনে রেখে সংযোজিত নতুন বৌদ্ধ দর্শনের কথা বলবার চেষ্টা করে গেছেন।

সন্মাত্রানন্দ অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে রচিত *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* উপন্যাসটি তিনটি কালের ব্যবধানে রচনা করেছেন। বর্তমান কাল, ত্রয়োদশ শতকের চাগ্ লোচাবার কথা ও একাদশ শতকের অতীশ দীপংকর। তিনটি যুগের অভিমুখ ঔপন্যাসিক রেখেছেন কিন্তু অতীশ জীবনের ওপর। তিনটি যুগকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যালেন্স করে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

মহাযান মতবাদ ব্যাখ্যা *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* উপন্যাসে ধর্মকীর্তির সঙ্গে অতীশ দীপংকরের কথোপকথনে উঠে আসছে—

> "...বুদ্ধশিষ্যগণ প্রায়শই তাঁদের নিজ মুক্তির সাধন করলেও তথাগত যে সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে উরুবেলায় ধ্যানস্থ হ'য়েছিলেন, তাতে কিন্তু কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে কী থেরবাদী হীনযান, কী মহাযান সকলেই একমত। আর এই সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির আদর্শ, যা বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর নিজ জীবনে অনুষ্ঠান ক'রে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেটিই মহাযান মতের আদর্শ।"[১৮]

নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রগুলির কথোপকথন এবং চিন্তনের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন— অদ্বয়বজ্রের উপদেশে বজ্রযানমত (অধ্যায়-৬); অতীশের ভাবনায় বৌদ্ধদর্শনের মূলসূত্র, বৌদ্ধদের বিভিন্ন শাখার দর্শন, বাৎসীপুরীর মত, পুদ্গলবাদী মত, সম্মিতীয় মত, সময়ের তত্ত্ব, সর্বাস্তিবাদীগণের প্রাপ্তি-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপ্রাপ্তিতত্ত্ব, এদের বিরুদ্ধপক্ষ সৌতান্ত্রিক মত, স্থবিরবাদী বৌদ্ধদিগের ভবাঙ্গতত্ত্ব, নির্বাণতত্ত্ব (অধ্যায়-১২), পঞ্চশীল (অধ্যায়-১৩); বজ্রাসনের বিচারসভায় নাস্তিক্যবাদের আলোচনা (অধ্যায়-১৯) ইত্যাদি।

নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা-র কেন্দ্রে রয়েছে সময়— তিব্বতীয় জপযন্ত্রের মতো ঘূর্ণ্যমান। আবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয় মানুষের জন্মান্তরব্যাপী অন্বেষণ। এই উপন্যাসে প্রায় ঊনচল্লিশটি চরিত্র আছে। তার মধ্যে মাত্র বারোটি যাদের মধ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান নেই, যাদের সাধারণ মানুষ বলা যায়। এর মধ্যে অমিতায়ুধেরই যা একটু বিস্তার আছে। বাকিরা সবাই আখ্যানের চালচিত্রের অংশ।

কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র অতীশের অন্বিষ্ট প্রেম; যা মাতৃহৃদয়ের বৎসলতা দিয়ে জগতের সব দুঃখ সব ভেদাভেদ দূর করে দিতে চায়। কিছু চরিত্র নির্মিত হয়েছে যাদের সংযোগে বা সংঘাতে অতীশের বোধের বিকাশ বা উত্তরণ ঘটেছে। একই সঙ্গে লেখক তাদের মধ্য দিয়ে আখ্যানের প্রেক্ষাপটে থাকা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ incidents একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে 'illustration of character' এবং 'exploration of the individual personality'। মহর্ষি জিতারি চন্দ্রগর্ভের (পূর্ণাশ্রমের অতীশ) সত্যান্বেষণ মার্গের দিশারী—

> "নিখিল জীবের বেদনার উৎস এই ভেদবুদ্ধি, যার আধারশিলায় গড়ে ওঠে অহমিকার প্রাসাদ।"[১৯]
>
> "এই ভেদবুদ্ধি পরমা আপ্রাপ্তির প্রবেশপথে প্রবল ও ভয়ালদর্শন প্রহরী, যাকে অতিক্রম না করলে মুক্তির পথ চিরাবরুদ্ধ থাকে।"[২০]
>
> "অহমিকা পরিত্যাগ কর। সেই উৎসের অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানে নিজেকে বিপন্ন কর।"[২১]

অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্র গুহ্যজ্ঞানবজ্রের (তন্ত্রসাধক অতীশ) কাছে বজ্রযানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুহ্যজ্ঞানবজ্র বাৎসল্যের আধার বাল্যসঙ্গিনী কুন্তলাকে সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ তাঁর সাধনার পথ সংসারের প্রতি নির্মমতায় নয়। তাই বজ্রডাকিনী তন্ত্রের (চক্রসাধনা, আসবপান, মদ্য-মাংস-মৈথুন) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'নির্মুক্ত শ্রামণ্য— উদাসীন ভিক্ষুচর্যা'র[২২] পন্থায় অগ্রসর হলেন। এরপর ওদন্তপুরী মহাবিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে শ্রামন্তে দীক্ষিত গুহ্যজ্ঞানবজ্র হলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। শীলরক্ষিতের সঙ্গে অতীশের আলোচনার সূত্রে লেখক বিস্তৃত করেছেন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার তুলনামূলক ভেদসীমা— সৌতান্ত্রিকদের বীজতত্ত্ব, স্থবিরবাদীদের ভবাঙ্গতত্ত্ব, মহাযানমতের আলয়বিজ্ঞান, সর্বাস্তিবাদী মত ইত্যাদি। আচার্যের তত্ত্বব্যাখ্যার উপস্থাপন কৌশলের অভিনবত্ব অতীশের চিত্তকে সমুদ্ভাসিত করেছে, তীব্রতর করেছে তাঁর সত্যান্বেষণের তৃষ্ণা। সুবর্ণবিহারের আচার্য ধর্মকীর্তির প্রবল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার উৎস-অনুসন্ধিৎসা ও তা দূরীকরণের আন্তরিক প্রয়াস অতীশকে আরও পরিণত করে তুলল। বৌদ্ধ শ্রমণের লক্ষ্য 'অর্হত্ত্ব' নয়, সমস্ত মানুষের মুক্তি— আচার্য ধর্মকীর্তির এই বিশ্বাস ও জীবনব্যাপী সাধনায় তার প্রয়োগ অতীশের জীবন-অন্বেষায় প্রতিফলিত হয়েছে। অতীশের শ্রমণ জীবনের আরও দুটি বাঁক হল তান্ত্রিক ও কবি ভিক্ষু মৈত্রীর বিক্রমশীল বিহার থেকে অতীশের বহিষ্কার এবং পাল ও চেদীরাজ্যের মধ্যে কূটনৈতিক দৌত্যপালন। পাল ও চেদীরাজ্যের সংঘাতের মধ্যে ঢুকে অতীশ একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিক্রমশীল মহাবিহারকে পৃষ্ঠপোষক রাজা নয়পালের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, সেই সঙ্গে রাজশক্তির উর্ধ্বে একজন সন্ন্যাসী/ আচার্যের ক্ষমতাকে প্রমাণিত করা। নয়পাল প্রদত্ত 'রাজভিক্ষু' বিশেষণ অতীশের অন্তরে নিজের অহংচেতনা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়েছে। বিক্রমশীল মহাবিহারের নীতি বিরোধী তন্ত্রসাধনার কারণে ভিক্ষু মৈত্রীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত অতীশের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল। কারণ তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস— ধর্ম ও জীবনচর্যা সঙ্ঘ দ্বারা নয় একমাত্র সত্য দ্বারাই নিয়মিত। অথচ সত্যের অন্বেষণে ব্যক্তি ও সঙ্ঘের বিরোধে সত্যান্বেষীকে বহিষ্কৃত হতে হল। 'সংঘ তার ভাবকে আরও বিস্তৃত করুক তাহলে যাকে আজ বিপত্তি মনে হচ্ছে, ভাবীকালে তা সম্পত্তিরূপে প্রতিভাত হবে।'[২৩] — ভিক্ষু মৈত্রীর এই উক্তি দীপঙ্করের মনে অনুশোচনার মধ্য দিয়ে সত্যের পথ চিহ্নিত করেছে। অতীশ ভ্রান্তি ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে সত্যের সন্ধানে চলমান চিন্তার প্রতীকীরূপ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'নাস্তিকের তর্কযুদ্ধ'-এ (উনিশ অধ্যায়) অতীশকে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করতে দেখা যাচ্ছে। নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরছেন। শূন্য তত্ত্ব নিয়ে একজন পণ্ডিত তার এই শূন্য তত্ত্বকে অর্থশূন্য বললে অতীশ তার জবাব দেয় জলদগম্ভীর স্বরে—

> "নাহ্, আমি কোনও মতবিশেষকেই নিরঙ্কুশ মনে করি না। এই বিশ্বজগতের কোনও বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলই পরস্পর নির্ভরশীল, সকলই পরতন্ত্র। এ জীবন একটা স্বপ্ন, আদিতে এ স্বপ্ন ছিল না, অন্তিমেও থাকবে না। অতএব, বর্তমানে যে এই জীবন অনুভব করছি, তারও কোনও সারবত্তা নাই। বন্ধন নাই, তাই নির্বাণও নাই। নির্বাণ যদি প্রাপনীয় বস্তু হয়, তবে তার আরম্ভ থাকবে। আর যার আরম্ভ আছে, তার অন্তও আছে। ওইরূপ আরম্ভ ও অন্তযুক্ত নির্বাণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবারণ নয়। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায় কোনও কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাই চতুরার্য সত্যকেও চরম বলা যায় না। পরমার্থত সংঘ নাই, ধর্ম নাই, বুদ্ধও নাই। এমনকি তথাগতও পরমার্থত সত্য নন। নির্বাণলাভের পূর্বে ও পরে তথাগত আছেন, তথাগত নাই, তথাগত এককালে আছেন এবং নাই, তথাগত অস্তি-নাস্তি-অনুভয়— ইত্যাকার কোনও কিছুই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই সমস্ত জগৎ স্বতন্ত্রসত্তারহিত, শূন্য।"[২৪]

স্থবির রত্নাকর এই কথা শুনে বলেন, তাহলে এ সমস্তই যদি শূন্য হয়, এ জীবন, জগৎ, শ্রামণ্য, সাধনা, বুদ্ধ, ধর্ম, এই সভা, এমনকি আপনার ওই যুক্তির দ্বারা শূন্যতা-প্রতিপাদনও নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়াবে।

অতীশ বলেন—

> "আমি শূন্য বলেছি, মহাস্থবির, নিরর্থক বলিনি। এ জগতের কোনও কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সকলই স্বতন্ত্রতাশূন্য এই মাত্র বলেছি। আমি কখনও বলিনি, এ জগৎ বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অলীক বা অর্থহীন। এ জীবন একটা আপাতত কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা। এর একটা ব্যবহারিক বা সাংস্কৃতিক সত্তা আছে। আর সেই লৌকিক সত্তাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রা, আধ্যাত্মিক সাধনা, বুদ্ধগণের আবির্ভাব, সদ্ধর্মদেশনা, সংঘপ্রতিষ্ঠা, চতুরার্যসত্য, বোধিলাভ প্রভৃতি নির্বাহ হয়। কিন্তু এসব কোনওকিছুই চরম সত্য নয়। যা পরম, তাতে জগতের অনুপ্রবেশ নাই, বুদ্ধিনিরূপিত কোনও সংজ্ঞা বা অভিধার অণুমাত্রও স্পর্শ নাই। মরুভূমির বালুকারাশির উপর ভ্রমবশত মরীচিকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু মরীচিকায় দৃষ্ট সেই মায়াসরোবরের মিথ্যা জলরাশি মরুভূমির একটি বালুকাকণাকেও ধৌত করতে পারে না। পরম সত্য তদ্রূপই প্রপঞ্চরহিত, প্রপঞ্চশূন্য। তা উৎপন্ন হয় না, তা শাশ্বত নয়, অশাশ্বতও নয়, একপ্রকার নয়, নানাপ্রকারও নয়, তাতে আগম নাই, নির্গমও নাই।"[২৫]

বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে অতীশের যে চিন্তন তা আবুল কাসেমের *অতীশ* ও সন্মাত্রানন্দের *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* উপন্যাস দুটির মধ্যে ঔপন্যাদিকদের দৃষ্টি অনুযায়ী উঠে এসেছে। তবে সন্মাত্রানন্দ কাহিনি ও বৌদ্ধ ধর্মমত বিশ্লেষণের জন্য সময়কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সময়ের এই ব্যবধান সন্মাত্রানন্দ প্রতিটি অধ্যায়ে উল্লেখ করলেও পাঠকের কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়তে হতে পারে। আবুল কাসেম কিন্তু সে পথে হাঁটেননি, তিনি অতীশের জীবনীকেই আধুনিক ভাষায় রচনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন অতীশের দর্শন। তবে দুটো উপন্যাস পাশাপাশি রেখে পড়লে অতীশ দীপংকর যে বৌদ্ধ দর্শনের নতুন অভিমুখ দেখিয়েছিলেন তা বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে।

Reference:

১. দাস, সঞ্জীব কুমার (২০২০), *বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শাসন*, কলকাতা : তথাগত, পৃ. ৫৭
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, অলকা (২০১৭), *অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, পৃ. ১২
৪. রাহুল সাংকৃত্যায়ন (২০১৫), *তিব্বতে সওয়া বছর*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, পৃ. ১৩৮
৫. তাঞ্জুর— তিব্বতে বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা ও মহান ভারতীয় এবং তিব্বতি আচার্যদের রচিত শাস্ত্রগুলি *তঞ্জুর* নামে সংকলিত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. কঞ্জুর— অতীশ সংগৃহীত বুদ্ধবাণীর সংগ্রহটি *কঞ্জুর* নামে পরিচিত।
৭. দাস, সঞ্জীব কুমার (২০২০), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯
৮. পূর্বোক্ত
৯. আবুল কাশেম (২০১৫), *অতীশ*, ঢাকা : অ্যার্ডন পাবলিকেশন, পৃ. ৩৯
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. পূর্বোক্ত
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯
১৬. পূর্বোক্ত
১৭. পূর্বোক্ত
১৮. সন্মাত্রানন্দ (২০২০), *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা*, কলকাতা : ধানসিড়ি, পৃ. ১২০
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯